রিজলি ম্যানরে এক স্মরণীয় সন্ধ্যা

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বিখ্যাত গবেষক মেরি লুইস বার্ক মন্তব্য করেছেন : ''পাশ্চাত্যে স্বামীজীর আগমন মরুভূমিতে হঠাৎ অমৃতের সন্ধান পাওয়ার মতো।'' পাশ্চাত্যের মানুষ জাগতিক বিষয়ে উন্নত হলেও অধ্যাত্মতৃষ্ণা তাদের আকুল করেছিল। যে-মানুষগুলির অন্তরে এই তৃষ্ণা জেগেছিল, স্বামীজীর বাণী তাদের কাছে কী বার্তা বহন করে এনেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই দেবমানবের আগমন সেখানে নতুন তীর্থক্ষেত্র তৈরি করেছিল। স্বামীজীর পদধূলিপূত সব স্থানগুলির সঠিক সংরক্ষণ না হলেও রিজলি ম্যানর তার ব্যতিক্রম। বর্তমানে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছেন বেদান্ত সোসাইটি অফ সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া। তার নতুন নামকরণ হয়েছে 'বিবেকানন্দ রিট্রিট'। নিউইয়র্কের কাছে শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে অলস্টার কাউন্টির এই এস্টেটের মালিক ছিলেন মি. ফ্রান্সিস লেগেট। স্বামীজী এখানে মোট তিনবার এসেছিলেন। ১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মে তিনি শেষবার এসে এখানে প্রায় আড়াই মাস কাটান। তাঁর থাকবার সবচেয়ে দীর্ঘ এ-সময়টিকে ভক্তেরা 'গ্রেট সামার' বলে উল্লেখ করেন।

রিজলির সম্পর্কে তার বর্তমান বাসিন্দাদের মুখে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা শুনেছিলাম। ফ্রান্সেস লেগেটের (ফ্রান্সিস ও বেটি লেগেটের কন্যা) ছেলে ফ্রাঙ্ক মার্জেসন রিজলির শেষ স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি এবং তাঁর পরিবার স্বামীজীর স্মৃতিকে জীবন্ত রাখার জন্য বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু আশি একর জমি সামলানো খুব কঠিন ছিল বলে ১৯৯০ সালে এই বিশাল সম্পত্তি তাঁরা বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেসময় ফ্রাঙ্ক-পত্নী হেলেনা বহু চেষ্টা করেও লাভজনক মূল্য পাচ্ছিলেন না। তিনি অনুভব করছিলেন, মিস ম্যাকলাউড অলক্ষ্যে থেকে তাঁদের এইরকম সিদ্ধান্ত নিতে যেন বাধা দিচ্ছেন! অবশেষে অনেক ওঠা-পড়ার পর এই জমিটি কেনার প্রস্তাব আসে রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে। বেদান্ত সোসাইটি অফ সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দজী স্থানটি অধিগ্রহণের জন্য সোসাইটির বোর্ডে সুপারিশ করেন। প্রথমে কোনও সদস্যই সম্মত হননি। পরদিন সকালে দুজন সদস্য এসে মহারাজকে জানান, তাঁরা এ-বিষয়ে সাহায্য করতে আগ্রহী। কারণ, আশ্চর্যজনকভাবে দুজনে একইরকম স্বপ্ন দেখেছেন যে, তাঁদের গুরু স্বামী প্রভবানন্দজী তাঁদের তিরস্কার করছেন এই বলে, স্বামীজীর

স্মৃতিধন্য রিজলি ম্যানর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে অথচ তাঁরা কিছু না করে নিশ্চেষ্টভাবে বসে আছেন কেন? যাই হোক, এরপর বেদান্ত সোসাইটি কিছু অর্থ দিয়ে রিজলি ম্যানর অধিগ্রহণ করলেন। ২০০৪-এর জানুয়ারিতে সিস্টার গার্গীর দেহত্যাগের পর তাঁর সম্পত্তি বিক্রয়ের অর্থে রিজলি ম্যানর সম্পূর্ণভাবে সোসাইটির অধীনে চলে আসে। সিস্টার গার্গী তাঁর উইলে বিশেষভাবে উল্লেখ করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ যেন রিজলি ম্যানরের জন্য ব্যয়িত হয়।

আমার রিজলি ম্যানর যাওয়ার সুবর্ণসুযোগ হয় ২০০৯ সালের জুলাই মাসে। গুরুপূর্ণিমার পুণ্যদিনে বিশ্বগুরুর শ্রীচরণবন্দনার বিরল সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। সেই রাতটি আমি সেখানেই কাটাই। মনে হয়েছিল, এখনও যেন স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণতি জানানোর জন্যই রিজলি ম্যানর স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। সেখানকার তপস্যারত প্রাচীন সুবিশাল দীর্ঘ ওকগাছগুলি সেই 'গ্রেট সামার'-কে আজও স্মরণ করিয়ে দেয়। ভিতরে বেশকিছু পরিবর্তন হলেও বাইরে মূলবাড়িটি একইরকম আছে। রিজলি ম্যানর দেখতে খুবই সুন্দর—তার বিশাল পোর্টিকো, মি. লেগেটের স্টাডিরুম, ডাইনিং হল—সবকিছুতে এখনও স্বামীজীর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এনট্রান্স হলে একটি সবুজ রঙের সোফা—যেখানে স্বামীজী বিশ্রাম করতেন। বাড়িতে প্রবেশ করতেই স্বামীজীর অর্ধশায়িত ছবি আমাদের স্বাগত জানাল। দেখে মড স্টামের স্মৃতিচারণটি মনে পড়ল : ''আমি যেন এখনো দেখতে পাই হলঘরের সবুজ গদিমোড়া পালঙ্কে ক্লান্ত এক শিশুর মতো টানটান হয়ে শুয়ে স্বামীজী অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।''

আমি যখন যাই তখন প্রব্রাজিকা গীতাপ্রাণা ছিলেন ইনচার্জ। দুপুর নাগাদ পৌঁছেছিলাম। তিনি আমাকে পুরো বাড়িটি এবং আশেপাশে সব ঘুরে দেখালেন। রাতে আমাকে বেটি লেগেটের ঘরে থাকতে দিলেন। সেখানকার হলওয়ে দিয়ে গেলে কোণে একটি ঘর, যেখানে স্বামীজী থাকতেন। ওই ঘরে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকার অনুমতি পেয়েছিলাম। রাতে সেখানে অনেকক্ষণ স্বামীজীর সান্নিধ্যে খুব আনন্দে কাটিয়েছিলাম।

এনট্রান্স হলে একটি ভিজিটার্স বুক আছে। সেখানে স্বামীজী মজা করে স্বাক্ষর করেছেন, 'Swami Vivekananda, a heathen, a Hindu' বলে। হিদেন শব্দের অর্থ বিধর্মী। তখন হিন্দুদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে এমনই ধারণা ছিল।

স্বামীজী থাকাকালীন একদিন মি. লেগেটের স্টাডিরুমে একটি মজার ঘটনা ঘটে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে অনুসরণ করে সেটি স্মরণ করি : লেগেট-ভবনে সাধারণ ড্রইংরুম ছাড়াও পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা ড্রইংরুম; না জানিয়ে একের অন্যের ড্রইংরুমে ঢোকার রীতি নেই। একদিন দুপুরে মিস ম্যাকলাউড পুরুষদের ড্রইংরুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন—এ-সময়ে কারও সেখানে থাকার কথা নয় তবু দরজা আধ-ভেজানো কেন? সন্দিগ্ধ হয়ে তিনি দরজা খুললেন, আর দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য—মি. লেগেট শূন্যে ভাসছেন। তারপরই ধপ করে একটা আওয়াজ, সঙ্গে 'উঃ হু হু' করে আর্তনাদ, তারপর স্বামীজীর

রিজলি ম্যানর

ধমক—''দরজায় টোকা না দিয়ে কী আক্কেলে ঢুকলে?'' আসলে স্বামীজী মি. লেগেটকে জিমন্যাসটিকের খেলা দেখাচ্ছিলেন—ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করছিলেন আর নিজের ঊর্ধ্বপদের উপর চেয়ার রেখে তার উপর মি. লেগেটকে বসিয়েছিলেন। এই সময়ে ঘরে মিস ম্যাকলাউডের প্রবেশ। ভদ্রমহিলার সামনে ওই দশা (হাঁটুর কাছে নেমে আসা প্যান্ট) নিতান্তই এটিকেট-বিরুদ্ধ। মি. লেগেটকে শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া স্বামীজীর আর উপায় ছিল না! তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে তিরস্কার করলেন। তারপর ভূপাতিত মি. লেগেটের দিকে তাকিয়ে মিস ম্যাকলাউডের উদ্দেশে গম্ভীরস্বরে বললেন, ''এখন এসো, দেখা যাক, মি. লেগেটের কী অবশিষ্ট আছে?''

স্বামীজী ছিলেন লেগেটদের সম্মানিত অতিথি। খাওয়ার সময় পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী তিনি সবসময় বেটি লেগেটের ডানদিকে বসতেন। বিদেশে খাওয়ার টেবিলে অনেকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু স্বামীজী ছিলেন সব বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। তাই তাঁকে হাঁটতে যাওয়ার জন্য কারও কাছে অনুমতি নিতে হত না। ইচ্ছামতো তিনি ডাইনিং টেবিলে বসতে ও উঠতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে আরও কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখার একটি গোপন উপায় জানা ছিল বেটির। মড স্টাম লিখেছেন, ''লেডি বেটি যেই বলে উঠতেন—আজ বোধহয় আইসক্রীম আছে, তাই না?—অমনি বাধ্য শিশুর মতো সুড়সুড় করে স্বামীজী তাঁর চেয়ারে এসে বসে পড়তেন, আর এমন হাসি হাসি মুখে আইসক্রীমের প্রতীক্ষা করতেন যে সেরকম সরল নিষ্পাপ আনন্দের হাসি ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরের মুখেও সচরাচর দেখা যায় না।''

আমি যখন রিজলিতে যাই তখন ডাইনিং হলে আট-দশটা চেয়ার ছিল। দর্শনার্থীরা বিশেষত ছোট ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকটি চেয়ারেই বসত, যাতে স্বামীজীর বসা সব চেয়ারে তারা বসতে পারে। শতবর্ষ প্রাচীন অনেক জিনিস সেখানে এখনও আছে। বলা বাহুল্য, সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি স্বামীজীর ব্যবহৃত। অনেক তৈলচিত্রও দেওয়ালে টাঙানো আছে। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলাম বেটির মেয়ে অ্যালবার্টার ছবি এবং তাঁদের পরিবারের কয়েকটি গ্রুপ ফোটো।

বেটির ঘরের জানালা থেকে দেখা যায় সুবিশাল লনের সুন্দর দৃশ্য। শুনলাম, যখন স্বামীজী সেই লনে রাজকীয় মহিমায় হাঁটতেন, বাড়ির সকল সদস্য তাঁকে মুগ্ধ হয়ে দেখত। আত্মারামের রাজকীয় মহিমা দর্শন করে তারা ধন্য হয়েছিল। মড স্টামের কথায় : ''তিনি যখন রিজলির লনে পায়চারি করতেন তখন তাঁর চেহারায় এমন এক মহিমা ফুটে উঠত, কবির ভাষায় বলতে গেলে, যা দেখে মনে হত তিনি যেন জগতকে দু-পায়ে মাড়িয়ে চরম উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছেন। অমন অননুকরণীয় বীরত্বব্যঞ্জক হাঁটা ইহজীবনে দেখিনি...।''

'গ্রেট সামার'-এর সেই দশ সপ্তাহে বাড়ির সকল সদস্য ও স্বামীজীর সঙ্গীরা ছাড়াও বহু মানুষ স্বামীজীকে দর্শন ও তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য আসতেন। স্বামীজীর বহু বিরল মুহূর্তের সাক্ষী এই বাড়িটি। কখনও তিনি গভীর ধ্যানস্থ থাকতেন আবার কখনও শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে খেলায় মেতে উঠতেন। তাঁর এই খেলার সঙ্গীরা হলেন, বেটির মেয়ে তিন বছরের ফ্রান্সেস (মেয়ে হলেও স্বামীজী তাকে 'বালগোপাল' বলে সম্বোধন করতেন), এক বছরের ক্যাথরিন হুইটমার্শ ও হলিস্টার। এদের মধ্যে হলিস্টার একটু বড়। তার সঙ্গে স্বামীজী গল্‌ফ খেলতেন। এদের প্রত্যেকের উপরেই স্বামীজীর বিশেষ আশীর্বাদ ছিল। এক সকালে ছোট্ট ফ্রান্সেস এসে তাঁর হাতে বাগানের কিছু ফুল উপহার দেয়। স্বামীজী ভাবগম্ভীর হয়ে বলেন, ''ভারতে আমরা গুরুকে ফুল দিই।'' এরপর তিনি তার মাথায় হাত

রেখে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করে আশীর্বাদ করেন।

ফ্রান্সেস পরবর্তী কালে কীভাবে স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হন তা অতি বিস্ময়ের। তাঁর বাবা ফ্রান্সিস লেগেট নিউইয়র্কে যখন মারা যান, দুর্ভাগ্যবশত তাঁর কাছে তখন কেউ ছিলেন না। পত্নী বেটি লেগেট তাঁর বোন জোসেফিন ম্যাকলাউড ও সন্তানদের সঙ্গে সে-সময় লন্ডনে। ফ্রান্সেসের বয়স তখন মাত্র বারো। বাবার অবস্থা দেখে, মা ও মাসির অনুপস্থিতির জন্য তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ে স্বামীজীর ওপর। তাঁর ধারণা হয়, স্বামীজীর আদর্শের প্রতি তার মা ও মাসির অত্যন্ত আগ্রহ ছিল বলেই তাঁরা বাবাকে অবহেলা করেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তী কালে নিজেকে সকলের কাছ থেকে সরিয়ে নেন। বড় হয়ে অবশ্য তিনি রিজলি ম্যানরে থাকতে এসেছিলেন। পরে হঠাৎ একদিন তিনি স্বামীজীর সব কথা জানতে চেয়ে মিস ম্যাকলাউডকে চিঠি লেখেন। চিঠিটি পড়ে জোসেফিন কৌতুকভরে বলেছিলেন, ''আমাদের ছেলেমেয়েরা আর কোথায় যাবে? আগে বা পরে এই আশ্রয়ে (অর্থাৎ স্বামীজীর পদপ্রান্তে) তাদের আসতেই হবে!''

স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বেটির প্রথমপক্ষের ছেলে হলিস্টারের বয়স ছিল কুড়ি। তার সমবয়সি বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সে অশ্বশালার দোতলায় থাকত। এই প্রাণবন্ত যুবকদল স্বামীজীকে খুবই ভালবাসত। হলিস্টার ছিল স্বামীজীর সেবা করার জন্য সবসময় তৎপর। স্বামীজীর জুতো পালিশ ইত্যাদি যেকোনও কাজেই সে সবসময় সানন্দে প্রস্তুত। কিন্তু স্বামীজী তাকে এ-কাজ করতে দিতে চাইতেন না।

একবার কথাপ্রসঙ্গে হলিস্টার স্বামীজীকে বলেছিল, সে সাধু হতে চায় না, স্বাভাবিক গার্হস্থ্যজীবন যাপন করতে চায়। স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, ''ঠিক আছে। তবে মনে রেখো তুমি কঠিনতর পথটিই বেছে নিলে।'' শেষ জীবনে হলিস্টারকে অনেক সমস্যা ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। তখন নিশ্চয় স্বামীজীর এই কথাগুলি তাঁর মনে পড়েছিল।

একবার হলিস্টার দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পায়—স্বামীজী ধ্যানে বসে কারও সঙ্গে হেসে কথা বলছেন। পরে জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, ''কী করব? ভগবান এত মজার!'' অনেক পরে হলিস্টারের নাতি-নাতনিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''আপনি কি ঈশ্বরবিশ্বাসী?'' তিনি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন, ''আমি ঈশ্বরকে দেখিনি ঠিকই। কিন্তু আমি স্বামীজীকে দেখেছি যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতেন ও হাসতেন।''

সত্যিই স্বামীজীর সময়ে রিজলি ম্যানর হয়ে উঠেছিল আনন্দনিকেতন। মনে পড়ে জনৈক বৃদ্ধ অধ্যাপক মার্চান্দ রিজলিতে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন। 'Late and Soon' বইতে ফ্রান্সেস লিখেছেন, মিস ম্যাকলাউড যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখন বৃদ্ধ আবেগভরে বলে ওঠেন, ''এটা ঈশ্বরের বাড়ি!'' আমার মনে হয় স্বামীজীর সান্নিধ্যে সেই গ্রীষ্মকালে রিজলি ম্যানর শিবধাম বারাণসীতুল্য হয়ে উঠেছিল।

থিওডর হুইটমার্শ ছিলেন ফ্রান্সিস লেগেটের ভাগ্নে। মি. লেগেট তাঁর অভিভাবক ছিলেন। তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং তিন সন্তান সেপ্টেম্বরের আগে পর্যন্ত রিজলি ম্যানর সংলগ্ন একটি ছোট কটেজে ছিলেন। সেই কটেজের নাম 'ইন্'। এইসময় ক্যাথরিন হুইটমার্শ স্বামীজীর সঙ্গে সময় কাটাতেন।

ক্যাথরিনের প্রসঙ্গ এখানে না করলেই নয়। স্বামীজীর পূতসঙ্গ তাঁর জীবনের গতি পালটে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তিনি সানন্দে ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত কথামৃতের ইংরেজি সংস্করণ 'The Gospel of Sri Ramakrishna' গ্রন্থের উপর তিনি

বিস্তারিত কাজ করেছেন এবং সেখানে ব্যবহৃত বহু শব্দের এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করেছেন। ১৯৭৬ সালে যখন তিনি শ্রীসারদা মঠে আসেন তখন আমরা তাঁকে দেখেছি। তাঁর মুখে সবসময় একটা প্রসন্নতা লেগে থাকত। তাঁর কাছে একটি বিশাল পর্দা ছিল। সেটি বিশেষভাবে অলংকৃত ছিল কথামৃতের বিভিন্ন দৃশ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উপমা ও ঘটনাবলি নিয়ে অ্যাপ্লিকের কাজ করা সেই পর্দাটি তিনি বেলুড় মঠকে উপহার দেবেন বলে নিয়ে এসেছিলেন।

রিজলি ম্যানরের 'লিটল কটেজ' থেকে বের হওয়া পথটি ধরে এগোলে 'ক্যাসিনো' (খেলার ঘর) পেরিয়ে খোলা মাঠের সামনের রাস্তায় পৌঁছনো যায়। সেই রাস্তার শেষে আছে বিরাট একটি ওক গাছ, যার তলায় স্বামীজী নিয়মিত ধ্যান করতেন। ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে তার নাম 'Swami's Oak'। ধ্যানের পর তিনি ডানদিকের পথটি ধরে 'ইন্'-এ থামতেন তাঁর শিশুসাথিদের সঙ্গে খেলা করতে। তাদের বয়ঃক্রম ছিল এক থেকে ছয়। খেলার পর তাদের খুচরো পয়সা দিতেন। এসবই ক্যাথরিন তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিলেন।

স্বামীজী যখন রিজলি ম্যানরে এসেছিলেন, প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে তখন তাঁর শরীর-মন দুই-ই ক্লান্ত। তাই বাড়ির প্রিয়জনেরা স্বামীজীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নিজের ইচ্ছামতো তিনি সময় কাটাতে পারতেন। জোসেফিন ম্যাকলাউড অনেক বছর পরে তাঁর বোনের মেয়েকে লিখেছিলেন, ''পরিবারের এই মনোভাবই স্বামীজীকে আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ করে দিয়েছিল। কখনও দিনের পর দিন কেটে যেত নিঃশব্দে, তিনি একটাও কথা বলতেন না। আবার কখনও দিনে-রাতে তিনি অবিরাম কথা বলে যেতেন। আমরা তাঁর ভাব অনুযায়ী তাঁকে সঙ্গ দিতাম বা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকতাম।... তাঁর ওপর আমরা কোনও জোর খাটাতাম না। পরিবারের প্রত্যেকেই চাইতেন যে স্বামীজী নিজের মনে থাকুন, কেউই তাঁর একান্তবাসে কোনওরকম বাধা হতেন না।''

যখন স্বামীজী আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ করতেন, তখন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন। সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত তার হিসেব থাকত না। ভগিনী নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন, স্বামীজীর কথাবার্তার মধ্যে কখনও কখনও 'অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ ঝলসে উঠত' এবং তাঁকে যদি একটানা দেখা যেত (কথাবার্তা বা বক্তৃতার সময় স্বামীজীর শিষ্যরা অন্যদিকে চোখ ফেরাতেই পারতেন না, এমনই অপূর্ব ছিল তাঁর মুখমণ্ডল ও বাণী), তাহলে 'অনন্তের দরজা খুলে যাওয়ার অনুভূতি হত'।

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা-মাতাজী ১৯৯৩ সালে গিয়েছিলেন রিজলি ম্যানরের কাছে ক্যাম্প পার্সিতে। ফ্রাঙ্ক মার্জেসনের কন্যা তখন ক্যাম্প পার্সির স্বত্বাধিকারিণী। বয়স মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ। মাতাজীকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে সাগ্রহে স্বামীজীর সেখানে থাকাকালীন খুঁটিনাটি বিবরণ মাতাজীকে বলে চলেছিল সে—তিনি কোথায় হাঁটতেন, কোথায় বসতেন, কী করতেন ইত্যাদি। মাতাজী অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, এতটুকু বয়সে এতসব সে জানল কী করে? সহজ উত্তর এসেছিল, ''ওঃ, এ তো আমাদের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন!''

একথা খুবই সত্যি যে, যত সময় গড়িয়েছে ততই স্বামীজী লেগেট পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছেন। পরিবারের সব ছোট ছেলেমেয়েই গুরুজনদের কাছ থেকে স্বামীজীর গল্প শুনেই বড় হয়েছে। তাই স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি তাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে।